আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও মহাশ্বেতা দেবীর কথোপকথন

‘ওদের ভাষায় শোষণ শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই’

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর অক্ষয় কীর্তি অনেকগুলো ছোটগল্প ছাড়াও দুটো উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা। এই খোয়াবনামা লেখা তিনি শেষ করেন ১৯৯৬ সালে, আর সেবছরই ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ক্যান্সার চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাঁর ডান পা কেটে ফেলে দিতে হয়। এরপর তিনি লেখালেখি ও শিক্ষকতার জগতে ফিরে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বছরের শেষ দিকে পরিস্থিতির অবনতি হয়। এসময় ঢাকায় সফর করেন ভারতের খ্যাতিমান কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী। বেশ কয়েকদিন মহাশ্বেতা ইলিয়াসের বাসায় আসেন, দীর্ঘসময় কথা বলেন, গান করেন। এক পর্যায়ে ইলিয়াস মহাশ্বেতা দেবীর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার নেবার আয়োজন করেন। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইলিয়াসের আজিমপুরের বাসভবনে এই আড্ডা হয়। এর কিছুদিন পরই, ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ভোরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। এবছর ২৮ জুলাই মহাশ্বেতা দেবী মৃত্যুবরণ করেন। রেকর্ডকৃত এই কথোপকথন থেকে অনুলিখন করেছেন তাসলিমা আখতার।

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

আ. ই.: মানে সূর্যগ্রহণের যে কুসংস্কার, সেটা আর থাকছে না।

ম. দে.: অত তর্ক-বিতর্কে গেলই না। ওরা এটা করে দেখাল। করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। খুব যে বীরত্বের কাজ করেছে, তা-ও মনে করল না।

আ. ই.: স্বাভাবিক কাজ করেছে।

ম. দে.: খুবই স্বাভাবিকভাবে এটা করেছে। ওদের যখন Midwife Training দিলাম, নিরক্ষর শবর মেয়ে। কিন্তু এদের ডাক্তার আর নার্সিং...নিজেরা নিজেদের জামাকাপড় সিদ্ধ করে রাখবে, পরিষ্কার থাকবে, তীরের ফলা দিয়ে বা ঝিনুক দিয়ে বা বাঁশের চাঁচ দিয়ে নাড়ি কাটবে না, নতুন ব্লেড দিয়ে কাটবে; সেটাকে শোধন করে নিয়ে, জলে ফুটিয়ে নিয়ে, অমুক করে তমুক করে– সব শেখানো হলো। করে ওদের Medical Kitbag ইস্যু করা হলো। বলা হলো, যা ফুরিয়ে যাবে তা তোমরা নিজেরা রোজগার করে ওর থেকে সেটাকে আবার কিনে নেবে। তার পরের কথা হচ্ছে, যে শিশুকে তুমি প্রসব করাবে, তার ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, তার দায়িত্বও তোমার। এক বছর পরে গিয়ে আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, এর থেকে লাভ কী হলো? ওরা প্রথম কথাই বলল–মা, ডাইনি চলে গেছে। নিরক্ষর শবর বলল, ডাইনি চলে গেছে। সাঁওতালরা ডাইনি বলে ডাইনিকে হত্যা করে। তার পেছনে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণ। ওর জমিজমা, গরু-বাছুর–এসব নেবে বলে। এটা সম্পূর্ণ আর্থিক কারণ। শবরদের ডাইনি বিশ্বাস আছে, যেমন মধ্যবিত্ত সমাজেও আছে প্রচুর, পাথর-টাথর বিশ্বাস, ডাইনি বিশ্বাসও আছে, নজর লাগা, বান লাগা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ডাইনি হত্যা নেই। বলল, ডাইনি চলে গেছে। আমি বললাম, কোথায় গেল? বলল, কোথায় যাবে, তারা গ্রামেই আছে। তারা এখন সব মাসি, পিসি, দিদিমা, ঠাকুমা হয়ে গেছে। বৃদ্ধাদেরই বলল হয়তো। এখন হয়েছে কী, যেসব মেয়ে কাজ করতে যায় মাঠে, তারা বাচ্চাদের ওদের কাছেই রেখে যায়। ওরা বাচ্চাদের দেখে, ওরা তার জন্য খেতে দেয়, নিজেরা গতরে খাটে। আসার সময় বাচ্চাকে নিয়ে চলে আসে। এভাবে Quietly কাজের ভেতর দিয়ে দিয়ে এই জিনিসগুলো আসছে। কাজেই শবররা এক অদ্ভুত জাতি।

আ. ই.: সরলও তো খুব। কিন্তু সবাই না...

ম. দে.: সরলতা না, এখনো খুব Down to earth আছে। ওদের কাছে, যেমন অদ্ভুত কথা বললাম না, ‘বিরসা মুন্ডা’ অনুবাদ করছে হো ভাষায়। তার পরে এসে বলে, শোষণ শব্দের কি উল্লেখ করব? আমি বললাম, তার মানে? হো, সাঁওতাল, মুন্ডারী– এসব ভাষায় Tribal Language-এ শোষণ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। কেননা ওরা শোষণ জিনিসটা জানত না। প্রতিহিংসার কোনো প্রতিশব্দ নেই। আমি প্রশান্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর কাকাকে যখন কেটে দিয়েছিল? ও বলল, সে দোষ করেছিল, তার মাথাটা কেটে দেওয়া হলো। এতে প্রতিহিংসার কী আছে? সে ঐ Industrial এলাকায় নিয়ে যাবে বলে চার-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে নিয়ে গিয়ে ওখানে বেচে দিয়ে টাউটের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। একবার কেন, দু-দুবার ধরা পড়ে। তো, মাথাটা কেটে দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রতিহিংসার কী আছে? তখন আমি বললাম, ‘শোষণই বসাও, হিন্দিতে তোমরা যা বলো, নাগরী হরফে শোষণ শব্দ বসাও’। এগুলো কিন্তু Exclusive অভিজ্ঞতা হয় মানুষের। যখন আমি জানতে পারি, যারা সারা জীবন শোষিত, তাদের ভাষায় শোষণ শব্দ নেই, সুদ শব্দ নেই, ধার দিতে পারো, সুদ হতে পারে না। আমি তোমায় টাকা ধার দিয়েছি, তুমি আমার চাষের সময় গতরে খেটে তুলে দাও। But I cannot charge. তোমাকে আমি ৩০ দিয়েছিলাম ৩০, তার বেশি আর হবে না। ওরা এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে। আপনি যে জিজ্ঞেস করলেন পুরুলিয়া জেলায় চাষ কম হয়। ক্ষেতমজুরি, Govt.-এর ডিক্লেয়ার্ড মজুরি সবাই পায় না, কেউই পায় না, কোনো অঞ্চলেই পায় না। সেখানে ওরা টাকা ১৫ করে পায়, মেয়ে-পুরুষ সমান।

আ. ই.: সরকারিটা কত?

ম. দে.: বর্ধমান-টর্ধমান বা ঝাড়গ্রাম-টারগ্রাম, যেখানে আন্দোলন আছে, সেখানে ভালো পায়।

ব. উ. : কুড়ি টাকা আর দুই কেজি চাল।

ম. দে.: এরা ১৫ টাকা ১২ টাকা, তার সঙ্গে খানিকটা মুড়িটুড়ি পায়। তার বেশি না। ওখানে তো Labour Surplus...চাষবাস...। পুরুলিয়া একমাত্র জেলা, যেখানে আপনি ১০ মাইল ১৫ মাইল দেখবেন প্রান্তর, কোনো জনমানুষ, বাড়িও নেই আর কোনো শস্যক্ষেতও নেই। রুক্ষ প্রান্তর। এই রকম দক্ষিণ পুরুলিয়া, যেটা ট্রাইবাল পুরুলিয়া। এখন এটা হয়, এ রকম হয়, তবে এটা সত্যি যে, পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ হবে না। পশ্চিমবঙ্গে আরেকটা জিনিস বন্ধ হয়েছে আজ থেকে ১০-১৫ বছর। আরো বেশি হতে পারে, ১৫ বছর তো বটেই। শহরের দিকে মাইগ্রেশনটা একদম চলে গেছে।

আ. ই.: ও আচ্ছা...

ম. দে.: কেননা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধরুন ১০০ টাকায় ১০০ পয়সার কাজ না হোক, ৪০ পয়সা ৫০ পয়সা ৬০ পয়সার কাজ হচ্ছে, কাজেই সকলেই কিছু না কিছু কাজ পাচ্ছে। এইভাবে শহরের দিকে মাইগ্রেশনটা চলে যাচ্ছে। এগুলো হয়েছে। এটা ঘটনা।

আ. ই.: আপনি শবরদের সম্পর্কে যে সমস্ত Experience আর কি, সেটা নিয়ে আপনি গল্পের মতো একটু বলবেন? সেটা শুধুমাত্র সিরিয়াস আলোচনা...আমার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটাই নিয়ে আসা ভালো।

ম. দে.: শবরদের Experience-এর তো কোনো শেষ নেই।

আ. ই.: যেমন তাদের মৃতদেহ, প্রথা, তার Experience. তারপর সরলতা...

ম. দে.: একবার আমাকে খুব হাঁটাল, ২০-২২ মাইল হাঁটলাম। ২০-২২ মাইল হাঁটা সোজা কথা নয়। এখন নয়, বছর দশেক আগে। আমি বললাম, তোরা কি আমাকে হাঁটিয়ে মেরে ফেলবি? ওরা বলল–না মা, খুব বড় পাথর দেব, অর্থাৎ ওরা সমাধিই দেয়। সমাধি দেওয়া সব অস্ট্রিক Tribe-এরই নিয়ম। সমাধি দিয়ে তারপর একটা পাথর দিয়ে চিহ্ন দেয়। ওরা বলল, বড় পাথর দেব। আমি বললাম, একটু চারদিকেই একটু বড় পাথর দিস। ওরা বলল–না, এ রকম পাথরই দেব, কিন্তু অ...নে...ক কষ্ট করে অ...নে...ক দূউউউউউর থেকে আনব।

আ. ই.: (হাসি) আপনার মরতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত না।

ম. দে.: এরপর আমি বললাম, তাই করিস। কিন্তু তাহলে তার ওপর একটা গাছ লাগিয়ে দিস। ওরা বলল, গাছ লাগালে কী হবে? আমি বললাম, গাছের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। একটা ভালো গাছ দিস, নিমগাছ দিস একটা। এখন ওরা খুব সমাধিতে গাছ লাগাচ্ছে।

আ. ই.: প্রতিটি সমাধিতেই?

ম. দে.: একটি করে নিমগাছ লাগাচ্ছে।

আ. ই.: তা ঐ যে মেলার যে আয়োজনটা, কবে শুরু হয়েছিল? শবরদের মেলা?

ম. দে.: শবরদের মেলাটা '৯১ সাল থেকে হচ্ছে। কারণ শবররা যখন এতটা জাগ্রত হয়ে একটা জায়গায় মিলিত হতে চায়, তখন মহাগড়ে প্রথম মেলা হলো। '৯১ সালের মেলাতে আমরা সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম চুনিকোটার.... ও তো পরে '৯২ সালে আত্মহত্যাই করল। মেলার ব্যাপার হচ্ছে, প্রস্তুতি যে হবে, এখানে মেলা হবে, এই দিক থেকে চাল, ডাল, পুরনো জামাকাপড়, যা ব্যবহারযোগ্য সবটুকু তৈরি করা, চাঁদা-টাকা তোলা, বিশাল কাজ একটা। কলকাতায় আমার ওপর দিয়ে যায়। সেদিকে ওরা বেশি তাকিয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলা থেকে অল্প কিছু আসে, পুরুলিয়া এমনিতে গরিব জেলা, যদিও নর্থ পুরুলিয়াতে কিছু ধনী লোক আছে। এখন এই যে মেলাটা হয়, এই মেলার যে প্রস্তুতি, এবেলা কম করে ১০-১১ হাজার, ওবেলা ১০-১১ হাজার। ওরা কিন্তু তিন দিন খায়। তার মানে, তিন দিনে আমরা ৬০ হাজার লোককে খাওয়াই, কম করে হলেও। বহিরাগত অনেকে আসে, তারা অত খায়ও না, আর ওদের খাওয়াটা আমি ধরছিও না। খাওয়ানো হয় শুধু খিচুড়ি-তরকারি। কিন্তু এই যে লোক আসে, ওরা অনেক আগে থেকেই আশপাশে যে সুড়িখানার Direction থাকে...মদের দোকান খুলবে না, মদ বিক্রি হবে না।

আ. ই.: এটা কি ওরা নিজেরাই...?

ম. দে.: ওরা নিজেরাই। কেননা ওরা জানে যে, ওদের মদ ছাড়া উচিত। একজন শুড়ি বলল–হা, তোরা এখন বন্ধ করে দিলি। যদি কিছু হয়েই যায়। আর শবররা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এখন তো সকাল, এখনই যদি কিছু হয়ে যায়, তুই ঠেকাতে পারবি? ধর তোর দোকানটা রইল না, তুই কিছু করতে পারবি? শবরকে সবাই ভয় পায়, কিছুই করা গেল না। সে শুড়িরা এখন এসে খুব বাধ্য হয়ে ওখানে বসে খিচুড়ি খেয়ে চলে গেল। এবং ওরা এই তিন দিন কোনো ভাত খায়নি। আর সমস্ত জিনিসটা একটা মাটির মঞ্চ আছে, শবররাই Organizer. ডিএম, এসপি– এ ধরনের লোকেরা সবাই আসে। তারা মাটিতে বসে। শবররা মঞ্চে বসে। শবররাই সমস্ত...পুরো জিনিসটাই ওরা Organize করে। রান্না ওরা করে, পরিবেশন ওরা করে। কিন্তু পুরো জিনিসটাই এত নীরবে আর এত সুশৃঙ্খলে হয় যে, যারাই দেখে, খুব অবাক হয়। তারপর অবশ্য মেলার তিন দিন পরে ৪০-৫০ জন ছেলে থেকেও যায়। তারা বাকিটাও ওয়াইন্ড-আপ করে, ডেকোরেটর-টেকোরেটর তুলে দিতে হবে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে। তারা ভাত খাবে সেদিন। তা আমাদের বীরেন ঠাকুর যে এত দিন ধরে রান্নায় দাঁড়িয়ে বলেছে, এটা ফ্যাল, ওটা দে, তদারকি করেছে। সেদিন বলা হয়েছে বীরেন ঠাকুর রান্না করবে, ভাত রান্না করবে। গোপী বল্লভ সিংহ, তিনি ঐ যে আমাদের...গোপী বীরেনকে বলেছে, বেলা আড়াইটার সময় ৪০টা তো মোটে ছেলে ছিল। তোমার তো আজকে বেশি কষ্ট হয়নি। বীরেন বলে–হা! চল্লিশটা ছেলে!! আমি ৬৩ কিলো চালের ভাত রাঁধলাম। ৬৩ কিলো চালের ভাত রেঁধে আমার ঘাড় দু-খাই হয়ে গেছে। পিঠ সব দু-খাই হয়ে গেল। আমি তিন দিন ঘুমাই নাই, আমি এখন ঘুমাব, বলে ধপাস করে পড়ে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন বেলা ১১-১২টায় উঠল আর যারা ৪০টা ছেলে ৬৩ কিলো চালের ভাত খেল তারা সন্ধে থেকে অদ্ভুত বাঁশি বাজিয়ে গান করতে লাগল।

আ. ই.: (হাসি) ভাতেরও প্রভাব ছিল মনে হয়?

ম. দে.: অসম্ভব, কল্পনা করা যায় না। একবার মাশরুম Training দিচ্ছি, মেয়েরা এসেছে। চার দিনের Training হয়ে গেছে। আর যায় না। কেউ বাচ্চাটাচ্চা আনেনি। কাজের সময় আর বাচ্চা কি, আমি জানি ওদের ছোট ছোট ছেলেপুলে আছে। আর তারা গানই করছে। আমাকে পাশে শুইয়ে অনেক রকম গান, ওদের বিহা গান, কেউ মরলে কি গান, ওমুক গান, তমুক গান শোনাচ্ছে। ওদের গ্রাম ২৫ মাইল দূরে। ওরা ২৫-৩০-৪০ মাইল হেঁটেই আসে। আমি একবার ভয়ে ভয়ে বললাম, তোরা যে এখানে-ওখানে একদম ছোট ছোট বাচ্চাদের বুথরা-বুথরি বলে আরেকটু বড় হলে দিদরা-ফিদরা বলে। আমি বললাম, তোদের বুথরা-বুথরি, দিদরা-ফিদরা– এগুলোকে কোথায় রেখে এলি? অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে বলল, বাপেরা দেখুগগা। তারপর সাত দিনের মাথায় বাপরা প্রায় সাশ্রুনয়নে স্ত্রীদের প্রার্থনা করতে এসেছেন, কী এখন না ফিরে গেলে আমাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হবে। বাপেরা দেখুগগা– এসব সাংঘাতিক গল্প আর খুব সহজও।

পোষা শবর সে মহাদুর্বৃত্তের কাজ করেছে। সে জামশেদপুর অঞ্চলে গিয়ে নাকি দুটি নারী ধর্ষণ করেছে। রাস্তায় গোপী বলছে–দিদি, আপনার শবর সন্তান, শবররা আমাকে মা বলে। যে শবর দম্পতির কথা বলা হচ্ছে, মেয়েটি চুয়ো করে চুল বাঁধে, কাঁধে একটা লতাপাতার ঝোলা, তাতে মধু, পুরুষটির কাঁধে একটি খাঁচা, তাতে একটা পাখি। এদিকে তীর-ধনুক এসব রয়েছে, কথা বলতে বলতে আসছে, আমি বললাম, গোপী বলল– হ্যাঁরে, পশুপতি ওর ডাকনাম, পোষা শবরের কী হবে? বলল, মরাইল দেব। মানে মেরে ফেলবে।

আ. ই.: ঠান্ডা হয়ে বলল?

ম. দে.: হ্যাঁ। আমি বললাম, মরাইল দিবি? পশুপতির বয়স কত?

হিসাব করে দেখা গেল, তা বছর ২৫-২৬। মরাইল দিবি? হ্যাঁ, তুই কাল আসবি, আমরা বসব। যে কিছু কাজ করলেই সমাজের সম্মতি নিতে হবে, সমাজ বসবে। আর আমি তো চিফ পারসন। ওদের মা, আমিও থাকব। আমরা সবই হ্যাঁ করব এবং পশুপতিকে মরাইল দেওয়া হবে। তার পরদিন গিয়ে ওপরের পাথরে আমি, মে মাসের গরম, পাথর ফেটে যাচ্ছে, আমি ফেটে যাচ্ছি। তারপর অবশ্য নিচে গোল হয়ে বসে অনেক করে ডিসাইড করা হলো, পশুকে একটা ভালো হওয়ার চান্স দেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলবে, ঠিকমতো হবেটবে। পোষা শবর যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সেই মেয়ে ওকে বিয়ে করেনি। এ রকম ঘটনা ঘটার পর ও স্ত্রী জাতির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। তবে নিজের জেলায় কিছু করতে ভয় পেয়েছিল। জেলা ছেড়ে সিংভূমে গিয়ে খারাপ কাজটি করে বসেছে। ফলে সিংহভূমে ওর ঢোকা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ তারাও তখন তাকে মরাইল দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাজেই এখন আর জেলা থেকে বেরোচ্ছে না। মরাইল দেব ওদের কথার কথা।

আ. ই.: আচ্ছা দিদি, আমি আরেকটা প্রশ্ন করি–আপনি পুলিশের প্রসঙ্গে বলেছেন কেমন? পুলিশের সঙ্গে শবরদের সব সময় একটা জেদাজেদি ধরনের সম্পর্ক আছে। সেটা এখন কী রকম সম্পর্ক? এবং এই পুলিশের কথা প্রাচীন কালের গানে কিভাবে এসেছে?

ম. দে.: প্রাচীন কালের গানকে ওরা রাত কাহানি বলে। একবারে একজন একটা কাহানি বলে আর সবাই রাত জাগে। পুরনো দিনের ওদের সৃষ্টিকথা, কী ছিল, জগন্নাথ দেব আমাদেরই ছিল, তা তখন সেই শবর দম্পতি পুজো করত, তাদের এক মেয়ে ছিল। জগন্নাথকে চুরি করার জন্য এক বামন এসে সেই মেয়েকে বিয়ে করল। বলল–ঠিক আছে করো, থাকো, খাটো বলল। তার এখন ইচ্ছে কোথায় জগন্নাথ লুকানো আছে, সে মেয়ের আঁচলে সাদা সরষে গেঁথে দিল। একটা ফুটো করে দিল, সরষে পড়তে পড়তে গেল। সেই সরষে ফুল অনুসরণ করতে করতে ও জগন্নাথ ধরল। জগন্নাথ ধরতেই তখন ও বলল, এখন আর আমাকে পাবি না। সে গড়িয়ে গিয়ে তার ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে তার হাত-পা সব ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। আর কিছুই নেই তার–কিছুই বোঝা গেল না। ধড়াম ধড়াম করে সমুদ্রের মধ্যে পড়ল, আমরা নীলাচল গাঁয়ে উঠব, নীলাচল যখন গাঁয়ে উঠবে, তখন ওরা চলে গেল। পুলিশ ছাড়া তো কিছু হবার নয়। পুলিশ রাজা সব পুলিশ-টুলিশ পাঠিয়ে দিল। জগন্নাথ তখন অনেক রকম Restriction আরোপ করল। এই সমস্ত পুলিশ, রাজার পুলিশরা এসে শবরদের কত করে বলল। বলল–না, আমরা যেমন ব্রাহ্মণও মানি না, পুলিশও মানব না। পুলিশরা তখন ধড়াম ধড়াম করে বর চেয়েছিল, মাটিতে পড়ে। এ রকমভাবে তাদের নিয়ে গিয়ে জগন্নাথের প্রথম পূজারি করা হলো।

যত রূপকথা বলেন, তখন তো রাজা এসে বলল, রাজকন্যাকে বিয়ে তখন দিতেই হবে। রাজা তো, তার মেয়ে হলো রাজকন্যা, ঘরে ঢুকতে পারে না। চারপাশে পুলিশ পুলিশ পুলিশ। পুলিশ সব জায়গায়। যত প্রাচীন কাহিনি–সে দুর্গার কাহিনি বলুন, শিবের কাহিনি বলুন। সব জায়গায় পুলিশ। এটা খুব Interesting. জীবনে যা কিছু আছে, সবটাতে পুলিশ আছে।

আ. ই.: (হাসি) তাহলে মহিষাসুর হয়তো নিশ্চয়ই এসপি হতো বা আইজি...।

ম. দে.: না, দারোগার ওপরে ওরা ভাবে না। এসপি-টেসপি না। তারপর যখন রাবণ বলল যে, শিবকে আমি মাথায় করে নিয়ে যাব। ঠিক যেদিন নিয়ে যাচ্ছে, রাবণ কী করে যাবে? বৈদ্যনাথ থানায় গিয়ে শিবের মায়ায় ওর তো বহুত পেশাব লেগেছে। রাবণ বলল, এখানে একটু বসো। তখন নামাতে গেছে যখন, তখন সেখানকার সব পুলিশ, পুলিশ শিব নামাতে দেবে না। কার হুকুমে তুমি শিব নামিয়েছ? (হাসি **আ. ই.:** পুলিশ ইজ দেয়ার) তখন রাবণের অবস্থা খুবই খারাপ। তখন রাবণ করল কি, দশ মুন্ডুর যে দশটা সোনার মুকুট ছিল, সব পুলিশদের দিল। (**ব. উ. :** পুলিশ তখনো ঘুষ খেত?)। বড় মুকুটটা দারোগাকে দিল। (সকলের হাসি) তারপর রাবণ ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডুয়িং...কিন্তু বাই দ্যাট টাইম তো বৈদ্যনাথের মন্দির হয়ে গেছে। তখন পুলিশই আবার রাবণকে তাড়িয়ে বার করল। তখন রাবণ নিজের দেশে ফিরে গেল। পুলিশ কবে ছিল না? রাম, সীতা, রামায়ণ–ওদের যত লোককথা–সব কিছুর মধ্যে পুলিশ ছিল। সব সময় পুলিশ। নদীতে পুলিশ। মাছে মাছে লড়াই হলো, মাছের পুলিশ চলে এলো। (ইলিয়াসের অট্টহাসি) সব জায়গায় পুলিশ।

আ. ই.: পুলিশকে নিয়ে একটা গান আছে না?। ঐটার সুরটা একটা গান না।

ম. দে.: (সুরে) পুলিশের কথা বলিস নারে পুলিশ মানে অ...ন্ধ...কার/পুলিশের কথা বলিস নারে, পুলিশ মানে কা...রা...গার/পুলিশের কথা বলিস নারে, কারাগারে বড় অন্ধকার, এভাবে ওরা গান করে।

আ. ই.: পুলিশের অত্যাচার তো সাংঘাতিক। (**নাইম :** তাই বলে গল্পের মধ্যে পুলিশ, মাছের মধ্যেও পুলিশ?)

ম. দে.: সব জায়গায় পুলিশ। Everything-এর পুলিশ আছে, সব কিছুর পুলিশ আছে। আমরা বুঝতে পারি না, এই যে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, পায়ের নিচে ধানক্ষেতে কত পোকাটোকা, তাদেরও পুলিশ আছে। সব জায়গায় পুলিশ আছে। আমরা কিন্তু জানতে পারছি না, কিন্তু পুলিশ ছাড়া কিছু হবার নয়। এই যে মেলাটা হয়েছে, তুমি ভাবছ আমরা মেলা করেছি, না। পুলিশও আছে। আমি বললাম–হ্যাঁ, পুলিশ তো আসেই। কেঁদা থানা থেকে আসে, অমুক থানা থেকে পুলিশ আসে, তারা বলল, সে পুলিশ নয়, মেলারও পুলিশ থাকে সব কিছুতে, রাতে কোনো ইয়ে হয়েছিল, মেঘ এসেছিল রান্নাবান্নার সময়ে? আসেনি, মেঘের পুলিশ সব মেঘ বন্ধ করে দিয়েছিল। কোনো হাওয়া হয়েছিল ধুলাটুলা পড়েছিল কোনো কিছুতে? হাওয়ার পুলিশ সব হাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কাজেই পুলিশের সর্বাত্মক ভূমিকা ওরা মোটামুটি মেনে নিয়েছে। তবে Actual life-এ যখন হরি শবরকে হত্যা করল বোড়ো থানার পুলিশ, তখন বোড়ো থানার শবররাই গিয়ে ঘিরে ছিল তিন দিন ধরে। এবং শবরদের কারণে ঐ জেলাতে এসপিও বদলি হয়েছে। দারোগা-টারোগার ডিমোশন-টিমোশন...এখন তারা যা-ই বলে সেটা পুলিশ মূল্য দেয়, মেনে নেয়। এটা হচ্ছে বোড়ো থানার পুলিশ। এ বছর পয়লা জুন যখন গত বছর '৯৬-এ পলিত শবরকে 'চল তোকে কাজ দেব, ঘাটে কাজ আছে' বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে ডান হাত কেটে নিল পঞ্চায়েতপ্রধান ও অন্যরা মিলে, তখন কিন্তু আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমিও খুব খেপে গিয়েছিলাম, বানজোড়া গ্রাম শবররা জ্বালিয়ে দেয়নি কেন। আর কথা নেই। যত বাস এদিকে আসছে, ওরা বাস থেকে যাত্রী সব নামিয়ে দিচ্ছে। শবররা প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে...। ওদের এটা হচ্ছে সমিতি। একটা 'হ' শুনে যাবে। একটা 'হ' বলতে হবে। কেননা গঠন যখন করা হয়েছে, সমিতির তো একটা সাংগঠনিক নিয়ম আছে, একটা 'হ' বলতে হয়। ওরা সবাই মিলে যখন বলল, তখন একটা 'হ' বলায় কথা উঠল। সমিতিতে যে বসে আছে, জলধর শবর, সে ওদের থেকে বয়সে অনেক কম। কিন্তু সে তো সেক্রেটারি। তখন

জলধর তো প্রকাশ্যে 'হ' বলতে পারে না। তার পরই জলধর নেচে নেচে বলল, সবাই বলেছিল। বানজোড়া গ্রামের কাছাকাছি এসব যখন অনেক করেটরে...তখনই প্রথম দেখা গেল এটা ভালো। এটা করেছে, ওদের সহজে করেছে। Under...ট্রায়াল হিসেবে কয়েক বছর থেকেছে।

আ. ই.: এটা কি এখনো করছে?

ম. দে.: হ্যাঁ, এখনো। এবং তারা কান্নাকাটি করছে শবরদের কাছে। যা নেংটো করাই গিয়ে, ওরা খুব হেসে বলছে, নইলে ডান হাত ফিরিয়ে দে। কিন্তু এখানে যেটা Important সেটা হলো, বিভিন্ন থানার শবররা এসেছিল। বরাবাজার থানার শবররাই শুধু আসেনি। আশপাশে যত থানা আছে–পুংচা, পুরুলিয়া সদর, কেঁদা–সব জায়গার শবররা এসেছিল। আজকে একটা শবরের গায়ে হাত পড়লে বিভিন্ন থানার শবররা সমবেত হয়ে সশস্ত্রভাবে লড়ছে। এটা একটা নতুন জিনিস।

আ. ই.: এটা আগে ছিল না, তাই না?

ম. দে.: They are shaking of fear like anything. পুলিশকে তো বলে কী করবি? মরাইল দিবি? বহুত মরাইছিস। দে, মারলে তো মারবি আর তো কিছু করতে পারবি না। আমার জমি নাই, ভূমি নাই, লেংটা ফকির। মার মার। কাজেই এখন পুলিশের হাত থেকে, ওসবের থেকে বহুত লড়াই শুরু করে। আমরা তো আছি। পুরুলিয়া শহরে চারটি উকিল বসিয়ে রেখেছি।

আ. ই.: বাঙালি?

ম. দে.: হ্যাঁ, চারটি উকিল বসিয়ে রেখেছি, যারা রাতদিন এদের কেস করে। এ না হলে না। এদের শবররাই গিয়েই ধরেছিল। এই কেস হয়ে গেল আর তুমি বলছ, তুমি এখন পায়খানায় যাবে। তোমার এখন পায়খানা যাওয়া হবে না। এই কেস হয়ে গেল, কোর্ট বসে গেল, চলো।

আ. ই.: এখন স্কুল করা হয়েছে, তাই না দিদি ওদের জন্য?

ম. দে.: না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একসময় আমাদের অ্যাডাল্ট লিটারেসি, Non formal school, ভলান্টারি সংস্থাকে দিতে পারত, দিয়েছিল। এক বছর খুব ভালোভাবে চলে। স্টেট গভর্নমেন্ট বলল, পুরুলিয়াকে আমরা Total লিটারেসির আওতায় আনছি। যেমন বর্ধমানে হয়েছিল। Agricultural-এ বর্ধমানে যা হয়েছিল। Industrial বর্ধমানে নেচারেলি ইল্লিটারেট থেকে যায়। যা হোক, মোস্টলি ইল্লিটারেট।

আ. ই.: Agriculture-এ বর্তমানে বোধ হয় ১০০% শিক্ষিত না?

ম. দে.: কাগজে তো তা-ই।

আ. ই.: কিন্তু Industrial-এ কোল মাইন-টাইন যে সব জায়গায় আছে।

ম. দে.: কোল মাইন কেন। আসানসোল থেকে আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর–সব জায়গাতেই ঐ তো Contractor's Labour আসে। তারপর দুই-ই করে দেয়, এই আসে এই যায়। আর পুরুলিয়ায় তো আরো। কারণ শবররা যেখানে থাকে, মেইন গ্রাম থেকে একুশ মাইল দূরে গিয়ে টিলায় উঠে তাদের লিটারেসি দেওয়া হচ্ছে। সেটা তো হয় না। তবে আমরা ঐটা চালাতে পারলাম না। এখানে চলে এলো। এখন যেটা হয়েছে, আমরা Donation তুলি, ইত্যাদি তুলি, যা যা করেছি। কারো Donation-এ পাঁচটা স্কুল চলে। সেখানকার বাচ্চারা দুপুরবেলা টিফিন পায়। এই খায়। সকাল থেকে ১১টা অব্দি ক্লাস করে। তারপর যারা একটু ক্লাসে এসেছে, তাদেরকে মাস্টার নিয়ে যায়, নিকটতম প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে যায়। ফিরে আসে। তারপর বিকেল থেকে মেয়েরা বসে।

ব. উ. : আচ্ছা, আপনি কি ডেনিস ওয়াকার বলে কোনো অস্ট্রেলিয়ানকে চেনেন, যে সাউথ তেহার এবং এসব জায়গার Tribal নিয়ে লিখছে?

ম. দে.: না, আমি চিনি না। বই হয়তো আছে। চিনি না, আমি যে বৃত্তে থাকি, তার বাইরে লোক খুব চিনি না।

ব. উ. : না, আমি ভাবলাম হয়তো আপনার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে।

ম. দে.: না না। আর শবরদের মধ্যে আমরা Outsider-দের ও রকম Research আর Research-এর নামে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ হয়ে গেছে আদিবাসীরা। কাজেই ওটা আমার বা সমিতির হাতের লেখা ছাড়া কোনো আউটসাইডার গিয়ে ঢুকবে, তারা শবরদের কাছ থেকেই সব তথ্য পাবে না।

আ. ই.: আচ্ছা, সেন্ট্রাল গভ. কিংবা স্টেট গভ. যেটাই হোক, ওদেরকে একটা ইচ্ছা থাক না থাক, বলে কি এদের Mainstream-এ নিয়ে আসা উচিত?

ম. দে.: না, এরা একটা Language-ই জানে, আমাদের ভদ্রলোকেরা, সরকারি লোকেরা, দেখে যে কী আনন্দ হলো, আপনারা ওদেরকে মেইনস্ট্রিমের কাছে নিয়ে এসেছেন। আমরা মেইনস্ট্রিমের থেকে যত দূরে থাকি, আমরা ততই আনন্দিত। আমি ওদের জন্য সোলার বিদ্যুৎ চাই, মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট চাই, আমি লিটারেসি চাই, আমি রাস্তা চাই, মানুষের মতো ঘর হবে, হাউজিং চাই, ড্রিংকিং ওয়াটার চাই। সবই চাই। Mainstream-এর মতো হওয়ার দুর্ভাগ্য যেন ওদের না হয়। কারণ এই মেইনস্ট্রিম আমি যা দেখছি, এই Mainstream nothing to offer them. এরা খুব Dedication নিয়ে তো কেউ যাবে না, এমন তো না যে কোনো ডাক্তার গিয়ে বসেই কাজ করবে, তা নিয়ে তো কেউ যাবে না। কাজেই মেইনস্ট্রিমের খেলা আমার আগেই দেখা হয়েছে।

আ. ই.: তো, এটা কি বাদ দেওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত?

ম. দে.: খেড়িয়া শবররা তো সংখ্যায় খুব কম। সাঁওতালরা যেমন জাতিতে অনেক। ওরা থাকেও ঐ বড় বড় গ্রামে। তাদের কব্জা করলে যে সুবিধা আছে, সমস্ত শবর মিলে কজন ভোটার, এত বড় বিস্তীর্ণ এলাকায়। ভোটের ব্যাপারে ওদের Attitude কী, জানো তো? 'ভুট লিবি তো যার নামে হয় লিয়ে নিস।' 'ভুট দিলে কী হয় তা তো আমরা দেখলাম।' 'ভুট দিলে কিছু হয় না।'

আ. ই.: (হাসি) এসব বলছে আর কি।

ম. দে.: আমরা যে মনে করি ওরা জানে না। গ্রামের লোকের কাছে শিখতে যাওয়া উচিত। শেখাতে যাওয়া উচিত নয়। (**আ. ই.:** এটা আমি বলি সব সময়) একটা রাস্তায় যদি মাটি পড়ে, ওমনি বলে 'হা, পঞ্চায়েত ভুট আসছে তো, তাহলে রাস্তায় মাটি পড়বে। এখানে এটা হবে, ওখানে ওটা হবে।' এসব। ওরা সব বোঝে। ওরা কম পলিটিসাইজড, কিন্তু খুব বোঝে।

আ. ই.: তো, আমাদের এখানে কিন্তু উমর ভাই, আমি যখন চাকমাদের মধ্যে যাই আর কি, তখনো যারা সাহেবসুলভ, চাকমারা তো মোটামুটিভাবে এক ধরনের সামরিক শাসনের মধ্যে আছে, তো যারা ভদ্র লোকজন, বড় বড় অফিসার, এদেরও কথা হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করছি এদের মেইনস্ট্রিমে নিয়ে আসতে। সে জন্য ওরা চাকমা ভাষা পড়াতে চায় না। চাকমা সংস্কৃতি...

ম. দে.: এখানেও ঠিক তা-ই হলো। যেখানে গিয়েছিলাম, রাজশাহী

থেকে ঐ যে মাধবপুরে। ওরা ওখানে বলল–না, একটা মজা আছে, সাঁওতালরা যারা খানিকটা মেইনস্ট্রিমের মতো হয়ে গেছে, তারা একমাত্র ভাষা আর সাহিত্য নিয়ে ভাবে।

আ. ই.: মানে ওদের ভাষা?

ম. দে.: হ্যাঁ, আমি হাসানকে বলেই এলাম যে সাঁওতালদের সঙ্গে যদি তোমাদের Interaction থাকে হয়, যারা রাজশাহী টাউনে থাকে, তারা চার পাতা শুধু লিখে দিক শুধু Just ঘর জানালা দরজা কপাট ইত্যাদি ইত্যাদি, বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষায়। বেসিক এগুলো চার পাতা দশ পাতা তোমরা এখন থেকে ছাপিয়ে দিতে পারো। কিন্তু যে যে স্টেটে থাকে, তাকে সেই স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেই হবে। সাঁওতাল সাঁওতালি ভাষা বললেই তো...কোনো কিছু হবে না। কোর্টে কাজ চলবে না, কিছু হবে না। ওরা সব সময় ভাষার সাহিত্য...সাহিত্যের কথা বলতে আমি বললাম পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর সাঁওতালি ম্যাগাজিন বের হয়। বই বের হয়। সংগঠন আছে। আমি বলব, তারা যদি তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারে তো ভালো। কোথায় পাঠাবে না পাঠাবে আমি জানি না। কাজেই তারা খানিকটা অন্য রকম হয়ে...আমি বললাম, ভাষা-সাহিত্য নিয়ে ভাবুন। ওরা বলল, সবেচেয়ে দুঃখের হচ্ছে ভাষা-সাহিত্য। আমি বললাম, না...সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে যে, চালের খর গলে পড়ছে...ফাঁক। সব থেকে বড় দুঃখ হলো, টিউবঅয়েল এ রকম। সব থেকে বড় দুঃখ হচ্ছে এই দূষিত জল। সব থেকে দুঃখ হচ্ছে আমি আসব বলে মাটি কোদাল দিয়ে কেটে তোমরা একটা আসার রাস্তা করেছ। Over night খেটে দেড় মাইল রাস্তা। সব থেকে বড় দুঃখ হচ্ছে এইগুলো। স্কুল নেই। লেখাপড়া শিখতে পারে না। শণ ভরাবার মতো জীবিকা নেই। মাটি তো নেইই। যা আছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম করেটরে...মাশরুম Training দিলে কী হতে পারে ভাবো। এইটুকুনের মধ্যে সবজি কি চাষ করতে পারে ভাবো, অমুক তমুক। এখানকার মাটি তো যথেষ্ট ভালো। কাজেই এগুলো বড় সমস্যা নয়, শিক্ষিত সাঁওতাল হলেই তার কাছে সমস্যা হচ্ছে ভাষা আর সাহিত্য। ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিরাট অবদান আছে। কিন্তু সাঁওতাল কেন, আদিবাসীর ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সংস্কৃতির সবগুলোই আছে। ওরা করম পর্ব করে, সারঘুল বা বাহা পর্ব করে। ওরা সোহারা বা বাদনাও করে। এগুলো সবই কৃষি-আশ্রিত জিনিস। সারঘুল বা বাহা হচ্ছে রবিশস্য ঘরে এনে নিয়ে...। তার পরে পহেলা মাঘ থেকে আবার ওদের নতুন বছর গণনা হয়।

আ. ই.: পহেলা মাঘ থেকে?

ম. দে.: তারপরে এই যে সোহারায় যেটা বা বাদনা পর্ব, সেটা হচ্ছে গরুতে গোয়াল করা, গরু জাগানো, গোয়াল পরিষ্কার করা, সকলের হয়তো গরু নেই। যার নেই তারাও সেদিন গৃহপালিত পশু নিয়ে ধর্মগান সারা রাত ধরে গানটান ইত্যাদি করে। করম পূজা খুবই সুন্দর। এখন তো করম গাছ নেই। অন্য গাছের ডাল এনে পোঁতে। তারা করে কী, ঐ সময় যে রবিশস্য হয়, ছোট ছোট ডালায় বালু রেখে জল দিয়ে আগের দিন মেয়েরা সব শস্যবীজ জাইয়ে রাখে। সেইগুলো সমস্ত নিয়ে আসে ব্রতধর্ম উপকথা কথা। আর ওদের বলে ব্রতধারিণী বা বারতী, বারতীরা শস্য দাও। বারতীরা একে একে যেন সব নিবেদন করে। তারপর সমস্ত রাত্রি গান হয়। সব কিছুর পরে নাচ আর গান।

আ. ই.: সবাই অংশগ্রহণ করে না?

ম. দে.: হ্যাঁ, বাহা বা সারঘুল হচ্ছে নতুন শালপাতা, মানে ফাল্গুন মাসের নতুন পাতা, ফল-ফুল–এসবের উৎসব।

নাইম : এসব উৎসব বছরে কটা?

ম. দে.: অনেক আছে। এখন সবগুলো বলতে পারব না। আছে। সারা বছরই আছে। তা ছাড়া আরো আছে প্রতিটি বাড়ির যেমন ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মানুষেরও তেমনি নিজস্ব দেবতা আছে। কী দেবতা কেউ জানতে পারবে না। তোমার কী দেবতা, আমার কী দেবতা, কেউ কখনো জানে না। তুমি জানো নাকি তা-ও কেউ জানে না। কিন্তু সকলেরই নাকি নিজস্ব একটা দেবতা আছে। কাজেই যখন সে লোকটা মারা গেল, তাকে কবর দেওয়া হলো, তাকে সেরিমুরালি বলা হয়, তোমার দেবতাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে গেছ। আর কোনো কারণেই তুমি অশান্ত হয়ো না, বলে মোরগ কেটে রক্তটা পুঁতে দেওয়া হয়। পুঁতে দেওয়ার পর এত দেবতা থাকে এবং অনেক নালিশ আসে। সাঁওতাল মেয়েরা নালিশ করে, আমরা এ রকম ও রকম বর্ধমানে লাঙল খাটতে গিয়েছিলাম। আমাদের তো জমিজমা নেই, তাই লাঙল খাটতে গিয়েছিলাম, দুই বোন। এসে দেখি আমাদের ঘরের দেবতা অন্য কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। যে নিয়ে গেছে সেও সাঁওতাল। ঘরের দেবতা কিভাবে চুরি হলো আমি গিয়েও অনেক Investigate করেও...What is ঘরের দেবতা, সেটা তো কোনো মূর্তি হবে না। সেটা যে কী তা কিছুতেই বেরোল না।

আ. ই.: তো, কিভাবে চুরি হলো?

ম. দে.: সে ওরা জানে কিভাবে চুরি হয়েছে।

আ. ই.: আধ্যাত্মিক চুরিও বলা যায় একে?

ম. দে.: অসম্ভব নয়। আবার তাকে ডেকে সমাজ বসানো হলো। বসে বলল, কারো ঘরের দেবতা চুরি করলে তার কী পরিণাম হয়? তখন তাদের যে নায়েকে বাদেশ মাঝি, প্রধান যে, সে তার ভয়ংকর সব বর্ণনা করল তার কী কী হবে। তার ছাগলকে সাপে কেটে নেবে। ওমুক হবে, তমুক হবে। এখন তো তার বাঘে খেয়ে নেবে বলে না। 'তোর ছেলে টাটায় কাজ করতে যাবে, কিন্তু সে আর ফিরবেক নাই।' ট্রাকে চাপা পড়ে মরে যাবে। আগে বলত বাঘে খাবে, সাপে কাটবে; এখন মেশিনে খাবে। এ রকম নানা রকম শোনার পর একদিন শোনা গেল প্রচুর ঢাকঢোল; শোনা গেল গৃহ দেবতা ফিরে এসেছে। গেল কবে যে ফিরে এলো!

আ. ই.: তাদের গৃহ দেবতা তো আবার ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ চেনে না।

ম. দে.: ঐ দুই বুড়ি ছাড়া আর কেউ জানে না। বুড়িরা যায় লাঙল খাটতে, ওটা খুব সুন্দর। ওরা যায় মেয়েদের Protection দিতে, ওরা নিজেরা কাজ করে না, বুঝলেন? এরা সারা দিন যা পায় সেই ভাতটা ওদের খাওয়ায়। ও এদের বাচ্চাকাচ্চা সামলে-টামলে রাখে।

আ. ই.: আচ্ছা, একটা জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে যে, শবর বলেন, সাঁওতাল বলেন, মুন্ডা (ম. দে.: অস্ট্রিক Tribe) বলেন, এদের মধ্যে এক ধরনের শৃঙ্খলাবোধ বেশ কাজ করে।

ম. দে.: অসম্ভব Discipline.

আ. ই.: এটা কিন্তু আমাদের যে সমাজ, সেখান থেকে আলাদা, তাই না? আমি যে চাকমাদের মধ্যেও দেখেছি, সাংঘাতিক শৃঙ্খলা...

(চলবে)